শতাব্দীসন্ধির ছোটগল্প

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যে এখন ছোটগল্পের বাজার ভালো নয়। পূজা সংখ্যাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় কে কটা উপন্যাস দিচ্ছে। প াবলিক লাইব্রেরিতে উপন্যাসের চাহিদা বেশি। বইপাড়ার লোকেরা বলেন উপন্যাসের তবু কাটতি আছে। ছোটগল্পের একেবারেই নেই। এই অবস্থায় বাংলা ছোটগল্পের ধারটিকে মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা করে চলেছে লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলিই। সব রকম রচনার পাঁচ মিশেলি সম্ভাবের ওপরও ছোটগল্প তো থাকেই। তা ছাড়া শুধু ছোট গল্পের ওপরও অনেকগুলি পত্রিকা আছে। ছোটগল্প বিষয়ে অ ালাদা সংখ্যাও বের হয়। এই সব সংখ্যায় বাংলা গল্প, অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদ গল্প এবং গল্প ও গল্পকারদের বিষয়ে প্রবন্ধ সবই থাকে। হাল আমলের নতুন লেখাগুলিকে এইভাবে পরিচিত করবার দায় নিয়েছেন লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরা।
হয়ত উপন্যাসে হাত দিতে তাঁদের কিছু অসুবিধা আছে। নিজেদের অনিশ্চিত অবস্থায় ধারাবাহিক বড় লেখার দায়িত্ব তাঁরা স্বভ াবতই নিতে পারেন না। তাই গল্পের খিদেটা তাঁরা মেটান ছোটগল্প এবং ক্বচিৎ কখনও বড় গল্প বা ছোট উপন্যাস দিয়ে। তবে কারণ যাই হোক এখনকার উঠতি ছোটগল্পলেখকদের প্রধান ভরসা লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনগুলিই, এবং এখান থেকেই একটা প্রতিনিধিমূলক সাম ান্য অংশ সৃষ্টিসন্ধান সংগ্রহশালায় ধরে রাখা হয়েছে।
এই লেখাগুলি থেকে হাল আমলের ছোটগল্পের বিশেষ কোনো লক্ষণ চোখে পড়ে কিনা এ প্রশ্ন খুবই সঙ্গত। ভালোমন্দমাঝারি মেশা বিশাল স্তূপের ভেতর থেকে ভালো লেখাটি বেছে আনা খুবই কঠিন। নির্বাচকমণ্ডলীর মানদণ্ডটিইযে সঠিক এমন অহংকার তাঁদের নেই। তবু মোটামুটি বিচারে বলা চলে যে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের গল্পের মান প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার গল্পমানের থেকে কোনো অংশেই কম নয়। বরং প্রকরনে ও বৈচিত্র্যে অনেক নজর কাড়া।

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস কিঞ্চিদধিক একশো বছরের। এই একশো বছরের মধ্যে বার বার তার গতিপথ বদলে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাবে রবীন্দ্রনাথের হাতে যখন বাংলা ছোটগল্পের পত্তন হল তখন পল্লীগ্রামের "ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছে াটছোট দুঃখকথা" ই তাঁর লক্ষ্য ছিল। সেই রবীন্দ্রনাথই কয়েকবছরের ব্যবধানে গল্পগুচ্ছ তৃতীয় পর্ব লেখবার সময় নিজেকে বদলে ফেললেন। আনলেন তির্যক দৃষ্টি, সমাজ সমালোচনা, ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্লীন নানা জটিল স্তর। যে লেখক দেনাপাওনা, পোষ্টমাষ্টার, সমাপ্তি প্রভৃতি দিয়ে শু করেছিলেন তাঁর কলম থেকেই বেরিয়ে এল স্ত্রীর পত্র, নামঞ্জুর গল্প, পয়লা নম্বর এর মত তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী রচনা। এরকম যে হল তার কারণ সাহিত্যে কখনও এক রীতি বেশিদিন চলে না। এখানে টিঁকে থাকার শর্তই হল উত্তরোত্তর নতুন রকমের লেখা। তাই রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধকেরা যুগধর্মে ও নিজ নিজ স্বভাবধর্মে প্রত্যেকেই আলাদা। কল্লোল, কালিকলম প্রভৃতি পত্রিকা আশ্রয় করে যে তণ লেখকগোষ্ঠী দেখা দিলেন তাঁরা অনেকেই বেছে নিলেন নিম্নবিত্ত নাগরিক জীবন বা হতদরিদ্র অন্ত্যজ জীবনের ক্লেদ ও গ্লানির বৃত্তান্ত। কথা বললেন সেখানকারই ভাষায়। বিংশ শতকের তৃতীয় দশক বাংলা ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ। তখন - বিভূতিভূষণের আত্মমগ্ন প্রকৃতিদৃষ্টি, তারাশঙ্করের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির সম্মিলিত প্রেক্ষিতে দেশের পরিবর্তনশীল রূপ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় ক্রমান্বয়ে ফ্রয়েডিয় ও মার্কসীয় তত্বের প্রয়োগপরীক্ষা একের পর এক ঢেউয়ের মত এসেছে। মোট ামুটি ঐ সময়েই বনফুল দেখিয়েছেন জীবনের উপরিতলের চঞ্চল ঝিকিমিকি, সূচনা করেছেন অণুগল্পের। সতীনাথ ভাদুড়ির র াজনৈতিক বীক্ষা, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসপ্রয়ান আমাদের মুগ্ধ করেছে। প্রমথ চৌধুরী তাঁর চার ইয়ারি কথা বা নীললো হিতের গল্পগুলি নিয়ে আমাদের বুদ্ধির কাছে আবেদন রেখেছেন। পরশুরাম মাতিয়েছেন উতরোল হাস্যে। এই রকমভাবে ক্রমাগত পরীক্ষানিরীক্ষায় বিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি বাংলা ছোটগল্প তার গতিধারা অব্যাহত রেখেছিল।
বিশ শতকেতর মধ্যভাগ বাঙ্গালীর জীবনে বড় দুঃসময়। ততদিনে দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগের পর্বগুলি পার হয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনত া এসে গেছে। খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে সমস্যার আর শেষ নেই। সেই সার্বিক উদ্‌ভ্রান্তির কালে বাংলা কথাসাহিত্যের মূল ধারাটি নিঃশব্দে ছোটগল্পকে গৌন করে দিয়ে উপন্যাসের দিকে প্রবাহিত হল। সবুজপত্রের যুগে প্রমথ চৌধুরী ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন বাংল াভাষায় উপন্যাসের সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল নয়, কারং স্বরূপ তিনি বলেছিলেন যে বাঙ্গালীর জীবন নিস্তরঙ্গ ও গতানুগতিক বলে সেখ ানে ছোটগল্পের বিকাশ স্বাভাধিক, কিন্তু মহৎ উপন্যাসের আবহাওয়া তৈরি হতে গেলে জাতীয় জীবনে যে সংঘাত ও বিশালতার

অভিজ্ঞতা দরকার বাঙ্গালীর তা নেই। এই ভবিষ্যদ্বানী সত্য হল না, কারণ বাঙ্গালীর ইতিহাসটাই বদলে গেল হঠাৎ। স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে উপর্যুপরি দুর্ভাগ্যের আঘাতে গৃহগতপ্রাণ বাঙ্গালী তার শান্তি স্থিতি ও সন্তোষ হারিয়ে ফেলল। তীব্র জীবনসংগ্রামে ভেঙে গেল তার সামাজিক অচলায়তন। মহৎ উপন্যাসের অনুকূল লগ্ন শু হল।

এর পর থেকে বাংলা উপন্যাসে যত পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে ছোটগল্পে ততটা হয় নি। লেখা হয়েছে বিস্তর। এ কালের ঔপন্যাসিকের া প্রত্যেকেই গল্পও লিখেছেন। সেগুলির উন্নত মান নিয়ে সন্দেহ নেই। তবুও একথা ঠিক যে তাঁদের উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্পগুলি নিষ্প্রভ। তাতে এমন কিছু নেই যা উপন্যাসে মিলবে না।

শতাব্দীশেষে মনে হচ্ছে বাংলা ছোটগল্প এতদিনে তার একটা নিজস্ব বাসভূমি খুঁজে পাচ্ছে। এখনও এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলব ার সময় আসে নি। উঠতি লেখকদের বিক্ষিপ্ত দু চারটি লেখা থেকে তাঁদের মনের কোনো হদিশ আমরা পুরোপুরি পাই না। যা করা যায় তা হল শুধুমাত্র কতগুলি প্রবণতাকে চিহ্নিত করা।

অসীম চট্টরাজের ছায়াঘর গল্পটি এই রকম -- চার বন্ধু মিলে একটা কমপিউটার প্রোগ্রাম চালু করেছিল। তাদের মধ্যে সঞ্জীবের দক্ষতা ছিল কম কিন্তু চেহারাটি ছিল সুদর্শন। সেই সঞ্জীবের নানা ভঙ্গী দিয়ে ইনটারনেট চ্যাট শো ভরিয়ে ওরা দর্শক টানত। সেই ট ানে আটকা পড়েছিল একটি মেয়ে। মেয়েটি ছাত্রী, হস্টেলে থাকে। সচ্ছল, সাহসী ও অ্যাডভেঞ্চারপ্রবন। চ্যাট শোর মাধ্যমে সঞ্জীবের সঙ্গে আলাপ করে তার মন ভরে নি। তাকে সে ভালোবেসে ফেলে এবং আরও বেশি করে জানতে চায়। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে অবশেষে মেয়েটি পৌঁছয় সেই ডেরায় যেখান থেকে ঐ চ্যাট শো হত। গিয়ে সে জানতে পারে সঞ্জীব অনেক আগেই মারা গেছে। ত াকে মেরে ফেলা হয়েছে কারন বেশির ভাগ লভ্যাংশ সে একাই দাবি করেছিল। এখন লোকে যা দেখে তা মৃত ব্যক্তির নানা ইমেজ ম াত্র। সঞ্জীবের সহকর্মীরা এই ইমেজগুলিকে জ্যান্ত করে নিজেদের টেকনিক্যাল জ্ঞান প্রয়োগ করে তাই দিয়ে ব্যবসা করছে।

সত্যিটা জানবার পর মেয়েটির মনে কোনও হৃদয়ঘটিত প্রতিক্রিয়া হল না। শোক দুঃখ নয়, ঠকে যাবার জন্য রাগ নয়। বিজ্ঞানের কেরামতিতে বিস্ময় নয়। সে শুধু বিমূঢ় হল এই ভেবে যে জগতে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা কে জানে? "সন্‌জিদা হস্টেলে গেল না। পূর্ণ চন্দ্রের আকাশে গিয়ে বসল গঙ্গার ধারে। স্টিমার ছাড়ার আওয়াজ, বড় জাহাজটার স্থির ভেসে থাকা, যা যা কিছু ও দেখছে, আশঙ্কা হয় সন্‌জিদার, তা কি দেখছে, না কি ডিসকভারি চ্যানেলের কোনো ডকুমেন্টরি?"

গল্পটা কল্পবিজ্ঞানের, কিন্তু একে ঘিরে ভিন্নতর অর্থব্যঞ্জনার একটি বলয় রয়েছে - তা হল খণ্ডিতপরিচয় মানবসম্পর্কের চেতনা। অ ামরা যার সঙ্গে চলি ফিরি, ঘরসংসার করি, তার ভেতরকার আসল মানুষটা যদি ইতিমধ্যে মরে গিয়ে থাকে তা কি আমরা সহজে বুঝি। তার নানা ইমেজের খণ্ডিত পরিচয়ের মালা গেঁথে তাই নিয়েই দিন চলে যায়।

এইরকম রূপকধর্মিতার ঝোঁক একালের বেশ কিছু গল্পে আছে। ব্যাপারটাকে কাব্যধর্মী বলা যায় কি? বিশেষ করে সাম্প্রতিক অনেক কবিতার ভেতরেই যেখানে প্রচ্ছন্ন থাকছে গল্প। জয় গোস্বামীর অনেক কবিতাই তাই। কবিতায় উপন্যাসোপম বড় গল্প লেখা হচ্ছে। শুধু জয় গোস্বামীর 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' ই নয়। অনেকদিন আগে আনন্দ বাগচি লিখেছিলেন 'স্বকালপুষ'। হারিয়ে যাওয় া সেই বই সম্প্রতি কোনও লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ইংরাজি ভাষাতেও সম্প্রতি কাব্যোউপন্যাস লেখা হচ্ছে এবং কে ানও কোনও লেখকের ছোটগল্পে থাকছে বিমূর্তের ব্যঞ্জনা। আমেরিকান লেখক রোয়াল্‌ড্‌ ডাহেল যার প্রকৃষ্ট উদাহরন।

অমর মিত্রের জগৎপুরের ভগবান গল্পে রয়েছে এইরকম প্রচ্ছন্ন কাব্যভাষা। কলকাতার আনন্দবাবু শস্তা পেয়ে জগৎপুরে খানিকটা জমি কিনেছিলেন। একটা বাড়িও করে রেখেছেন। কিন্তু বসবাস করতে পারছেন না। কারন এখানে পাকারাস্তা, বাসট, জলকল, ইলেকট্রিক লাইন এসব কিছুই নেই। অসহিষ্ণু আনন্দবাবু বলেন " কবে হবে?" আর এখানকার আদি বাসিন্দা গৌড়ের মণ্ডল নিশ্চি ন্তে বলে আপনি বাস কন না, ও সব ভগবান যেদিন চাইবেন সেদিনই হবে।" এই চাপান উতোরের মধ্য দিয়ে দিনের পর দিন কাটে। আনন্দবাবুর আর জগৎপুরে আসা হয় না।

এ গল্প নগরায়ন সমস্যার গল্প নয়। মধ্যবিত্তের বাড়ি করা নিয়ে স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্নভঙ্গের গল্পও নয়। এ হল দুটো দৃষ্টিভঙ্গীর গল্প, একটা চায় উন্নতি, অন্যটা চায় সন্তোষ। এখন জগৎপুরের কোন বাসিন্দা কি নিয়ে আনন্দে থাকবে সেটা সে নিজেই ঠিক কক।

কোথাও কোনও ঘটনা নেই এমন গল্প আছে, যেমন রাজা লিখিত জীবন। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কামরায় একটা বছর দশেকের ছেলে ভিক্ষা করছে। ছেলেটা একা এবং বোবা। সঙ্গে প্লাস্টিকের থলিতে দুটো আধপচা আম ছাড়া আর সঙ্গে কিছু নেই। এই ছেলেকে নিয়ে যাত্রীরা নানা জনে নানা রকম মন্তব্য করছে এবং পরক্ষনেই তার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে এটা খুবই গতানুগতিক একটা স্কেচ। যাত্রীদের ব্যবহারবৈচিত্র্যের মধ্যে সমাজের চেহারাটা ফুটে উঠছে। সতর্ক, সন্দেহপরায়ন, ঝিনিন্দুক, সবজ ান্তা, নির্দয়, কনা দেখাতে চাওয়া, নানারকম মানুষ আছে। আছে কুরোসাওয়া - পুদোভকিন আওড়ানো আঁতেল তণ তনীও। আছে অনীক নামের এক সফল শহুরে বহিরাগত ছেলে, এইরকম ট্রেনযাত্রা যার কাছে নতুন। এই ভিন্ন পরিস্থিতির ছেলেটির দৃষ্টিকোন দিয়ে দেখা হয়েছে বলেই গল্পে একটা অভিনবত্ব এসেছে। সে ঈষৎ কৌতুককৌতূহলে সব কিছু দেখছিল, যদিও বোবা ভিখারি বালক সম্বন্ধে সেও ছিল উদাসীন। শেষে নোআদার ঢাল নামক এক ছোট্ট স্টেশন আসে। জানালা দিয়ে অনীক দেখে সামনে প্ল্যাটফর্মে বসে

আছে ময়লা থান পড়া খুনখুনে এক বুড়ি। ট্রেন ছাড়বার পর অনীকের চোখে পড়ল হঠাৎ কোথা থেকে ট্রেনের সেই বোবা ছেলেটা এসে বুড়ির পাশে দাঁড়িয়েছে। দুজনে হাত ধরাধরি করে ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে। "প্রতি মূহূর্তে দূরে সরে যেতে থাকা সেই বালক, নুব্জ্য বৃদ্ধা, দিগন্ত বিস্তারী ধানক্ষেত, আর ক্রমশ ম্লান হয়ে আসা দিনের আলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে অনীক।"

কথাসাহিত্যের সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার হল সমসাময়িক জীবন। এরপর সে কথায় আসি।

সম্প্রতি আমাদের দেশটা দ্রুত বদলাচ্ছে। ইন্টারনেট ও কেব্‌ল্ টিভির দৌলতে পৃথিবীর কোনও কিছু আর অজানা নেই। ঝিায়নের হাত ধরে হচ্ছে নগরায়ন। কলকাতা ও মফঃস্বলের ক্রমস্ফীতি, নতুন নতুন ফ্ল্যাটবাড়ির বাহারি নক্‌শা বুঝিয়ে দিচ্ছে লোকের জীবনয াপনপ্রনালীর ক্রমপরিবর্তনশীলতা। ঝকঝকে ফ্লাইওভারের ধারে ধারে বিশাল হোর্ডিংগুলি সেক্‌স্ ও লোভের নিপুন ছলনায় দর্শককে এক মায়াজীবনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। শুধু তেল সাবান ক্রিম শ্যামপুর শস্তা লোভানি নয়। উচচমানের ফ্ল্যাট, ব্র্যান্ডেড গাড়ি, ন ামকরা হোটেলে ডিনার, সপরিবারে বিদেশ ভ্রমন -- এইসব কাম্যবস্ত এখন অনেকেরই নাগালের মধ্যে এসেছে। এ সব বা ততোধিক যারা পেল তারা সেজন্য কী মূল্য দিল, এবং কেমন আছে, যারা পাবার জন্য মরিয়া তারা কেমন আছে, এবং যারা পাবে না কিন্তু প াবার জন্য লোলুপ ও বিক্ষুব্ধ তারা কেমন আছে, সব ছবিই আধুনিক ছোটগল্পে পাওয়া যায়। তবে কিছুকাল আগেও যেমন গরিব বড়লোক শ্রেণীনির্নয়ের একটা বাঁধা ছক ছিল -- ধনী হলেই খারাপ আর গরিব হলেই ভালো, আর দুয়ের সম্পর্ক শুধুই শ্রেনীসংগ্র ামের সেই সব মোটাদাগের ধ্যানধারনা থেকে একালের গল্পকারেরা অনেকটাই মুক্ত। এমন কি নারী সম্পর্কে একালের মূল্যায়নও বদলে যাচ্ছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছামতী বেরিয়েছিল। সেখানে স্বৈরিনী নারী গয়া সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন "মেয়েমানুষ কিনা, তাই পাপপথে গেলেও তার হৃদয়ের ধর্ম বজায় আছে ঠিক।" এখনকার কালের কোনও লেখক আর এই ক্ষমাশীল চোখে মেয়েদের দেখেন না। শিক্ষাবিস্তার, চাকরির সুযোগ, সম্পত্তির অধিকার এবং আইনি রক্ষাকজচ মেয়েদের অ াত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুলে দিয়েছে, এবংসমাজের কোন কোন শ্রেনীর নারী সেই প্রতিষ্ঠা পেয়েও গেছে। পাবার পর দেখা যাচ্ছে, অন্ততঃ লেখকেরা সেই রকমই দেখেছেন, যে হৃদয়ধর্মে নারী বড়' এটা নেহাতই গল্পকথা। সুযোগ পেলে স্ত্রী পুষ দুজনেই সমান খারাপ হতে পারে। আধুনিক গল্পকারেরা অনেকেই এভাবে মানুষের শ্রেণীপরিচয়ের অন্তরালবর্তী আত্মাটাকে দেখতে চান। তাই মানবসম্পর্কের জটিলতা নিয়ে বহু গল্প আছে। বিশেষত ঃ ভাতকাপড়ের সমস্যা যেখানে নেই সেখানেই এসববেশি আছে। আছে দম্পতির পরস্পরের কাছে নিজেকে লুকোবার চেষ্টা, আছে সচছল সংসারের নির্দয় আত্মকেন্দ্রিক নারী, নিজের পরিবারে কোনঠাসা পুষ, প্রেমহীন দাম্পত্যের বিমূঢ় সন্তান। অসংযম দেখে যারা বড় হল তাদের উদ্দাম বয়ঃসন্ধি। নিজের বিবেককে সুবিধার খাতিরে অবিরত চুপ করিয়ে রাখার আত্মনিপীড়ন। এ সবই গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে, তবে সোজাসুজি গল্প বলার রীতি এখন আর নেই। সব কিছুর উপর লেখকেরা একটা পাতলা দার্শনিকতার আড়াল টেনে দিতেই যেন বেশি আগ্রহী।

একটু আগেই দেশের উন্নতির কথা বলেছি। এই উন্নতির একটা উলটো পিঠও আছে। আজ যেখানে মায়াপুরীর মত আলো ঝলমল আবাসন, কিছু কাল আগেই হয়ত সেখানে ছিল ডাঙ্গা, জঙ্গল, খেত ও গ্রাম। সেখানকার আদি অধিবাসীরা কোথায় গেল? কিভ াবে এখন তারা সংসার চালায়? বাঁকুড়া মেদিনীপুরের দিকে নিঃশব্দে মাইলের পর মাইল জঙ্গল লোপাট হয়ে যাচ্ছে। বন্য হাতি লে াকালয়ে চলে আসছে। জঙ্গলের আশ্রয়ে যারা বাস করত সেই সব মানুষেরা কোথায় গেল? কাগজে তাদের খবর বেরোয় না। জীবনানন্দ হলে বলতেন তারা হেমন্তের অবিরল পাতার মতন ঝরে গেছে। আধুনিক উদ্বাস্তুদের এই ঝরে যাবার বৃত্তান্ত এখনও কে ানও নামকরা লেখকের বিষয়বস্তু হয় নি। কিন্তু নতুন লেখকদের মধ্যে, যাঁদের গ্রামগঞ্জে শেকড় আছে কেউ কেউ সচেতন হয়েছেন। হতদরিদ্র অঞ্চলে আজকাল দালাল ঘোরে। তারা শুধু মেয়ে পাচার করে না, ছেলেদেরও করে। উঠতি বয়সের কর্মহীন ছেলেরা ক াজের আশায় চালান হয়ে যায় মুম্বই, গুজরাট, দিল্লির বস্তিতে। সেখানে তাদের অর্ধাহার বন্দিদশা, যৌনপীড়নের ইতিহাস পরিব ারের বাইরে বিশেষ ছড়ায় না, কারন তাদের না আছে ইউনিয়ন, না আছে ভোটাধিকার।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের ছবিটা আর একরকম। সেখানে মেধাবী, করিতকর্মা এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা আজক াল স্বদেশে বা বিদেশে যেখানে হোক একটা কাজ জুটিয়ে নেয়। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সেই অংশ, যারা মেধাবী নয়, নিম্নমানের স্কুল কলেজে পড়ে কোনোমতে পাশ করে বেরিয়েছে, ঠিকমত বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ যাদের নেই, একটা চলন সই জীবিকা খুঁজতে খুঁজতে ত াদের সারা যৌবনকালটা কেটে যায় তারপর নানা উঞ্ছবৃত্তির মধ্য দিয়ে কাটে বাকি জীবন। এদের একটা বড় অংশকে কাজে লাগিয়ে রাখে রাজনৈতিক দলগুলি। শরীরের শিরায় শিরায় যেভাবে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে আজকাল ক্ষমতা দখলের রাজনীতি সেভাবে আম াদের সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। নেতারা এই ছেলেদের সেই কাজে লাগায় এবং কাজ শেষ হলে অনায়াসে নষ্ট করে ফেলে। এ বিষয়ের গল্প প্রায়ই দেখা যায়। ঘটনাচক্রে যারা অন্ধকার জগতে পা বাড়ায় তাদেরও গল্প আছে। আর যারা কোথাও গেল না, কেবল আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে গেল তাদের কথাও লেখকেরা মনে রেখেছেন।

এই বহুবিচিত্র সমাজজীবন থেকে তুলে আনা দু চারটি গল্প এবার দেখা যাক।

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্যের অথ "বর্ণ বিবর্ণ আন্দোলন কথা" একটি অল্প কথার গল্প। একদিন ছুটির সময় কোনও কারখানার মালিক জনৈক

শ্রমিককে ফরমাশ করেছিল এক গ্লাস জল দিয়ে যাও। এতে আত্মমর্যাদার হানি হল মনে করে ঐ শ্রমিক এমন আন্দোলন পাকিয়ে তুলেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত মালিককে ক্ষমা চাইতে হয়। এ ঘটনার তিরিশ বছর পরে এখন পুরোনো মালিকের ছেলে মালি, এবং পুরনো শ্রমিকের ছেলে শ্রমিক হয়েছে। একদিন সবে ছুটি হয়েছে এমন সময় ঐ মালিক ঐ শ্রমিকের কাছে এক গ্লাস জল চাইল। শ্রমিক কিছুমাত্র আপত্তি না করে তক্ষুনি জল এনে দিল এবং পরিবর্তে মালিকের কাছে বকশিস পেয়ে খুবই খুশী হল।

বুদ্ধদেব গুহর নান্দনিক উত্তমপুষে বলা গল্প। বত্তা প্রবীন লোক , ধনী এবং সফল চাকুরিজীবী। ইদানিং তার শরীর ভালো যাচ্ছে না বলে সেবাযত্নের জন্য বেয়ারা নন্দনের ওপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়। স্ত্রী তৃনা সোসাইটি লেডি। স্বামীর দেখভাল করবার সময় বা ইচ্ছা কোনটাই তার নেই। তাতে অসুবিধা হয় না কারন নন্দন তার মনিবকে আন্তরিক ভালোবাসে ও যত্ন করে। ছেলেটির বুদ্ধিপ্রখর, তাই অবসর সময়ে মোটর ড্রাইভিং শিখে নিয়েছে। যদিও এখনও লাইসেন্স পায় নি। সৎপথে সে উন্নতি করতে চায়। এই নন্দনকে কয়েকটা পুরনো শাড়ি চুরি করার মিথ্যে অপবাদ দিয়ে একদিন গৃহকর্ত্রী তাড়িয়ে দিল। আসল কারন নন্দন তার স্বামীর শিবিরের লোক, সে তার হাতের মুঠোয় থাকবে না। তার গম্ভীর ও সংযত স্বভাবের কাছে কর্ত্রীর ইগো আহত হত সেটাও একটা কারন। মোটের ওপর নন্দনকে অন্যায় করে তাড়ানো হল এবং যাবার আগে তার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হল না। ক্ষুব্ধ গৃহকর্তা মনে মনে ভাবে "ঝাড়খণ্ডে (নন্দনের দেশ) মাওবাদিদের খুব দৌরাত্ম্যের খবর পড়ি কাগজে। নন্দনের ঠিকানা আমার কাছে নেই, তৃনার কাছে আছে। ভাবলাম ওকে একটা চিঠি দিয়ে দিই। বলি -- যা ভিড়ে যা ওদের দলে।'

ভগীরথ মিশ্রের সুন্দরবনে বাঘ দেখা বেশ উপভোগ্য গল্প। সুন্দরবনের পাখিরালয়ে কলকাতা থেকে একটা দল এসেছে। অফিসার লোক সব, বাড়ির ছেলেমেয়েরাও সুন্দরবন না বলে বলে সুন্ - ডোর - বন্। যথারীতি খানাপিনা, রংতামাশা, গৃহিনীদের ব্যাঘ্রভীতি এবং কর্তাদের বাঘ মোকাবিলার সাহসী গল্পে সারাদিন কেটেছে। নিঃশব্দে তাদের সেবা করে যাচ্ছে স্থানীয় বেহারা রতিকান্ত। রাত নামলে এক সাহেব ঢুলুঢুলু চোখে রতিকান্তকে ডাকেন। তারপর এইরকম কথাবার্তা হয়। --

সাহের রতিকান্তকে বলেন-- "কী হে, গ্রাম ট্রাম আছে - নাকি এদিকে?"

"আছে তো।" -- খুব নির্লিপ্ত জবাব রতিকান্তের

"তাতে মানুষ থাকে?"

"থাকে বৈকি, অনেক মানুষ থাকে।"

"কী বলছ?" ভার্মা সাহেব রতিকান্তের প্রতি সামান্য বিরক্ত বুঝি। "আমি তো কতবার এসেছি এদিকটায়। খালি তো জঙ্গল আর জঙ্গল। গ্রাম কই? মানুষ কই?"

রতিকান্তের সারা মুখে আলোআঁধারি ছায়াখানি প্রকট হয়। চোখের মনিজোড়া সামান্য জ্বলে ওঠে। খুব চেরা গলায় বলে ওঠে "মানুষ কী করে দেখবেন হুজুর? সন্দরবনে তো কেউ মানুষ দেখতে আসেনা। সবাই বাঘ দেখতে আসেন হুজুর, বাঘ!" বলতে বলতে দপ্ করে জ্বলে ওঠে রতিকান্তের চোখ। ক্ষনেকের তরে পশুর চোখের মত নীলাভ হয় চোখের মনি।

সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের শিরোনামহীন এক অতি সাধারন ছেলের গল্প। মানব চত্রবর্তীর জীবিকা টিউশনি। তার বয়স আটাশ, বাবা মৃত, বোন এক মিস্ত্রির সঙ্গে পালিয়ে গেছে, তার খোঁজ নেই। একদা মানবের একটি প্রেমিকা ছিল। তারা এখন ফ্ল্যাট কিনে অন্য পাড়ায় উঠে গেছে। মেয়েটি ভালো চাকরি করে। কালভদ্রে তাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়। একদিন মানবেরা তিন বন্ধু মিলে মজা করতে করতে এক গণৎকারের কাছে হাত দেখাতে গিয়েছিলে। মানবের হাত দেখে গনৎকার বলল -- এ হাতে আপাতত ভালো কিছু হবার নেই। -- কিছুই কি নেই? হাঁ, আছে বটে একটা জিনিস, তবে তা কোনো কাজে লাগবে না। কী জিনিস? গনৎকার বলল-এ গ্রেট লাভ। অবিশ্বাসের মধ্যেও কথাটা মানবের কানের কাছে গুনগুন করে। অনিবার্যভাবে তার পা চলে যায় প্রেমিকার বাড়ির দিকে। গিয়ে দেখে সেখানে আজ জোর মজলিশ। চাকরিতে তার একটা বড় লিফ্ট্ হয়েছে। তাই বন্ধুবান্ধবের নেমন্তন্ন। মানবকে সে আদর করে তাদের মধ্যে নিয়েযায়। সেখানে তার আলাপ হয় ঝকঝকে এক যুবকের সঙ্গে, যে মেয়েটির বর্তমান প্রেমিক এবং ভাবী স্বামী। এই যুবকের চোখে অভ্রান্তভাবে ফুটে আছে মানবের সম্পর্কে গভীর অবজ্ঞা ও চাপা বিদ্রূপ। মর্মাহত মানব নিমন্ত্রনের হৈ হল্লা থেকে যত তাড়াতাড়ি পারে পালিয়ে আসে। পালিয়ে এসে সে যায় তার দৈনন্দিন কাজে। এই সময় একটা ফাঁকিবাজ, বাচাল টিন এজার মেয়েকে সে পড়ায়। সেদিন পড়ার ফাঁকে বিমর্ষ বিরক্ত মানবের দিকে হঠাৎ মুখ তুলে মেয়েটা বলে ওঠে "মাস্টারমশাই, আমি আপনাকে খুব কষ্ট দিই, না? " মানব চমকে যায়। ঐ দৃষ্টি ঐ স্বর তার অন্তরাত্মা চেনে। এ হল গনৎকার কথিত "এ গ্রেট লাভ" যা এখন আর তার মত ভাঙাচোরা মানুষের কোনও কাজে লাগবে না।

এইভাবেই আধুনিক বাংলা ছোটগল্পগুলিতে উঠে আসছে সমকালীন জীবনের নানা খন্ডচিত্র।

উপসংহারের দিকে যেতে যেতে অনিবার্যভাবেই কয়েকটি প্রশ্ন মনে আসে। গল্পলেখকেরা জীবনের খণ্ডচিত্র দেখাবার সময় বিশেষকরে সেইগুলিকেই কেন বেছে আনেন যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হতাশা, ক্ষোভ, মোহভঙ্গ? কেন তাঁরা মনে মনে এত তিক্ত? আশা, আনন্দ, প্রেমের ছবি নেই তা নয় তবে তুলনায় কম। হাসির গল্পও কম। এমন হবার নানা কারন থাকতে পারে। হয়ত এককালে সরল নিটোল

সুখের গল্প বাংলা ভাষায় অনেক লেখা হয়েছিল বলেই এখনকার লেখককুল কালের নিয়মে বিপরীত মুখী। এমনও হতে পারে যেঠিক এই মূহূর্তে বাঙ্গালীর জীবনে বড় কোনও আদর্শ না থাকায় তার মন কোনও বিশ্বাসে স্থিত হতে পারছে না। তাই ভিতরে বাইরে শুধু - ভাঙচুরই দেখছে। কিংবা এও হতে পারে যে এটা একটা সাময়িক অবস্থা। কারন যাই হোক সমসাময়িক গল্প আমাদের একটা অস্থির, অনিশ্চিত, বিক্ষুব্ধ ও প্রাকুল জগতের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।